খিলাফতের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে শাইখ আবু মুনযির আশ-শানকীতী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

শরীয়তের মাপকাঠিতে খিলাফতের এলান

আলোচনায়: শাইখ আবু মুনযির আশ-শানকীতী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)

উৎস: https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=226191

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া



- - - - - - - - - - - - - - - - -

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাথীবর্গের উপর। অতঃপর:

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে খিলাফতের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে, যখন খিলাফতের ব্যাপারে 'দাওলাতুল ইসলাম ইরাক ওয়াশ শাম' (আইএসআইএস) এলান (ঘোষণা) করেছে।

উক্ত বিষয়টিতে শরীয়তের নির্ভেজাল দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করতে নিরপেক্ষ প্রয়াস চালিয়েছি, তাই আল্লাহকে সাহায্যকারী বানিয়ে আর ইখলাস ও সরলতা ও সওয়াবের আশা রেখে আমার আলোচনা শুরু করছি।

অনেকে মনে করেন যে, শরয়ী নেতৃত্ব (ইমামত) খিলাফত ব্যতীতই সম্ভব এবং ইমামত ও খিলাফত উভয়টাই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আসলে এটা একটা ভুল চিন্তা...!

প্রকৃতপক্ষে শরয়ী নেতৃত্বই হলো খিলাফত। কারণ শরীয়তে উভয়ের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নাই। কাজেই, যেখানেই ইসলামী নেতা পাওয়া যাবে, তিনি-ই খলীফা - চাই মানুষ তাকে খলীফা বলে সম্বোধন করুক অথবা আমীর বলে সম্বোধন করুক। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তব শরীয়ত আর প্রচলিত প্রথার মধ্যে পার্থক্য না করার কারণেই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

তাই শরীয়তের মাপকাঠিতে খিলাফতের দিকে গভীর মনোনিবেশ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আবশ্যক, আর কোনো বিষয়ের হুকুমের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলে তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের হয়ে আসে। আর প্রচলিত রাজনীতি ও খিলাফতের মধ্যে পার্থক্য বুঝাও আবশ্যক, কেননা হতে পারে যে, শরীয়তের মানদন্ডে হয়তো খিলাফত উপস্থিত রয়েছে কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত রাজনীতির মানদন্ডে তাকে অনুপস্থিত দেখাচ্ছে।

এখন যখন আমরা খিলাফত ফিরিয়ে আনার আবশ্যকতা নিয়ে কথা বলি, তখন তার মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের মাঝে শরীয়তী খিলাফতের অনুপস্থিতির স্বীকৃতি দিচ্ছি! বরং আমরা আল্লাহর কাছে এর জন্য কৃতজ্ঞ যে, এই হুকুম সেদিন থেকে উপস্থিত, যেদিন থেকে আফগানিস্তানে তালেবানদের হাতে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছে। কিন্তু যে খিলাফত আমাদের মাঝে অনুপস্থিত সেটা হল প্রচলিত রাজনীতির নিয়মানুসারে খিলাফত।

এ কথার ব্যাখ্যা ভালোভাবে সাব্যস্ত করার জন্য বলবো, শরীয়তের মাপকাঠিতে প্রকৃত খিলাফত বা খিলাফতে শরইয়্যাহ হলো, সর্বোচ্চ বড় নেতৃত্বের জন্য মুসলমানদের ভেতর থেকে কোনো ব্যক্তির হাতে বায়আত দেয়া - সেই বায়আতের সময় কালে অথবা পরে সমস্ত মুসলিম দেশের উপর তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতা বলবৎ থাকুক বা না থাকুক। তবে শর্ত হলো, তার পূর্বে অন্য কারো উপর এই শরীয়তী বায়আতকর্ম সংগঠিত হওয়া যাবে না।

অপরদিকে, খিলাফতে উরফিয়্যাহ (বর্তমানে প্রচলিত খেলাফতের সংজ্ঞা) হলো, "প্রচলিত রাজনৈতিক ধারণা" যা হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের সকল অথবা অধিকাংশ দেশ কর্তৃক একজনকে মুসলিমদের নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তাদের দ্বীনে শ্রবণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে কর্তৃত্ব দেওয়া।

আর শরয়ী আহকামসমূহকে বর্তমানে প্রচলিত ধারণার সাথে সম্পর্কিত করা যাবে না। এক্ষেত্রে একমাত্র শরীয়তের চিরন্তন বাস্তবতাই কার্যকর হবে। অর্থাৎ, খলীফার দায়িত্ব একমাত্র সেই প্রথম আমীরকেই দেয়া হবে যাকে শরয়ী বায়আত দেওয়া হয়েছে - যদিও তিনি খিলাফতের আহবান না করেন, তবুও তিনিই খলীফা, কারণ প্রকৃত শরীয়তের আলোকে ঐ বায়আতই খিলাফতের বায়আত।

বাস্তব খিলাফতের মর্মের ব্যাপারে উপরোক্ত ভাবনা নিজের বুদ্ধি থেকে আনি নি, বরং এটি শরীয়তের নসসমূহের (দলিলসমূহ) বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট ফলাফল; শরীয়ত একাধিক নেতৃত্বকে নিষেধ করে এবং সেই প্রথম ব্যক্তিকেই খিলাফতের দায়িত্ব দেয় যাকে প্রথম বায়আত দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী দেশসমূহের ভেতর থেকে যে কোনো ভূমির মুসলমানেরা কোনো শরয়ী ইমামকে বায়আত প্রদান করলো এবং তাঁর প্রতি বায়আত ও নেতৃত্বকে দৃঢ় করলো; অতঃপর অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত দায়িত্বের দাবি করলো এ কথা বলে যে, "আপনাকে দেয়া বায়আত তো হচ্ছে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের আমীর হিসেবে আর আমি তো সমগ্র মুসলমানদের থেকে খিলাফতের বায়আত নিচ্ছি যে, আমি খলীফাতুল মুসলিমীন" – শরীয়ত এর অনুমোদন দেয় না।

এমন ধরনের দাবি শুধুমাত্র 'ইমারত' ও 'খিলাফত' শব্দের পার্থক্যের ভিত্তিতে হয়েছে, শরীয়তে যার কোনো ভিত্তিই নাই। কারণ, এ পার্থক্য করা হয়েছে প্রচলিত প্রথার উপর ভিত্তি করে যা শরীয়তের বাস্তবতা নাকচ করে দেয়। খিলাফত হলো, মুসলমানদের দায়িত্বভার/অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা, আর যে ব্যক্তিই মুসলমানদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকেই খলীফা বলা হবে।

এখন বাকি রইলো শুধু নির্দিষ্ট করা যে, একাধিক আমীরের আবির্ভাব হলে এই (খিলাফতের) পদের হক্দার কে হবে।

এমনিভাবে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম জনপদসমূহের আমীর ও খলীফাতুল মুসলিমীন পদ দু'টির মাঝে কোনো পার্থক্য নাই। সুতরাং, নেতার যে অধিকার, উভয়ের অধিকার এক। নেতার যে দায়িত্ব, উভয়ের একই দায়িত্ব।

উভয়ের মাঝে শুধু পার্থক্য হলো, প্রথমজন বেশ কিছু ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে অথবা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন নি। আর দ্বিতীয়জন কিছু রাষ্ট্রসমূহে অথবা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন...

নেতৃত্বের জন্য 'কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা' ইসলামী শরীয়তের হুকুমে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ 'কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা' নেতৃত্বের জন্য শর্ত নয়। নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় বায়আতের মাধ্যমে, কর্তৃত্বের দ্বারা নয়। এ অর্থে শরয়ী সীমারেখায় খিলাফতে উসমানী আর খিলাফতে তালেবানী এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

****

যদি সমস্ত মুসলমানদের এক আমীরের নেতৃত্বে একাতাবদ্ধ করতে হয়, তবে একাধিক ‘ইমারত’ বৈধ হতে পারে না। আর যদি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আভির্ভাব হয়ও, তবুও তাদের অনুমোদন দেয় না।

এমতাবস্থায় শরয়ী আমীর তিনিই হবেন যিনি প্রথম বায়আত প্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা প্রথম বায়আত গ্রহণকারীর দাবি পূর্ণ করো, তারপর যে প্রথম তার দাবি।”[১]

সুতরাং অন্যান্য নেতৃত্বের ব্যাপারে কথা হলো, তার ভিত্তিই নাই, কেননা যে বিষয়ের অস্তিত্ব শরীয়তে নেই, তা বাস্তবেও থাকবে না। উক্ত (বিরোধপূর্ণ) বিষয় আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। তাই বলবো...

যদি এ যমানায় সব অঞ্চলের মুসলমানেরা এক আমীরের নেতৃত্বে আমলী দৃষ্টিকোণ থেকে একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয়, তবে প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের উপর শরয়ী আবশ্যকতা হলো, যথাসম্ভব তাদের উপর নিযুক্ত আমীর এর সাথে সম্পৃক্ততা রাখা।

সুতরাং সোমালিয়া অথবা আযওয়াদ অথবা লিবিয়া অথবা আল জাজিরা অথবা ইরাকে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কোনো সমস্যা নাই যদি এক আমীরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব না হয়।

আর যদি বর্তমানে এক আমীরের নেতৃত্বে সমস্ত মুসলমানদের একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়, তবে একাধিক ইমারত এর বৈধতা নাই। আর সমস্ত আমীরের উপর ওয়াজিব হলো প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ করা। আর এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি হলেন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর।

তাহলে আমীরুল মুমিনীন কে?

সেই ব্যক্তিই আমীরুল মুমিনীন, যাকে মুসলমানগণ শরয়ী বায়আত দান করেছেন - চাই তাকে আমীরুল মুমিনীন হিসেবে নামকরণ করা হোক অথবা ‘রইসুদ্দাওলাহ’ (দাওলাহ এর নেতা) বলা হোক, চাই তিনি খিলাফতের অধিকার দাবি করুন বা না করুন। তার এ

---

[১] حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ». صحيح مسلم

অধিকারের প্রাপ্তি ঘটেছে একমাত্র বায়আত এর মাধ্যমে। আর আমরা সেটাই গ্রহণ করবো যেটা শরীয়তে ইসলামীতে প্রতিষ্ঠিত, যদিও বা প্রচলিত রাজনীতিতে তার অনুপস্থিতি রয়েছে।

কেননা ফিকহী মূলনীতি হলো, 'শরয়ীভাবে বিদ্যমান বিষয় বাস্তবে বিদ্যমান বিষয়ের মতোই।' এই মূলনীতির অর্থ হলো: শরীয়ত যা আদেশ করেছে তার স্বীয় আবশ্যক বিষয়াদি ও সামর্থ্য যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে যদি বাস্তবে তার প্রচলন না-ও থাকে তবুও তা বিদ্যমান বলে গণ্য হবে। কেননা শরয়ী বিষয়াদি শরীয়ত দ্বারাই বিবেচিত হবে, প্রচলিত মতাদর্শের ভিত্তিতে নয়। তাই, শরীয়ত যার উপস্থিতি গণ্য করতে বলেছে তাকে গণ্য করা ওয়াজিব - চাই তার প্রচলন থাকুক বা না থাকুক।

এই মূলনীতির দলিল হলো,

عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله – عليه وسلم : "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" رواه البخاري

১। আসেম বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি এখানে রাত্র হয় আর ওখানে দিন হয় আর সূর্য ডুবে যায়, তখন (যেন) রোজাদার ইফতার করে ফেললো।" (বুখারী)

আর একথা সর্বজনবিদিত বা প্রচলিত যে, রোজাদার যতক্ষণ পর্যন্ত না খাবার মুখে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইফতারকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু কথা হলো, যখন রোজার শরয়ী সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলো, তখন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ইফতারকারী সাব্যস্ত হয়ে গেলো যদিও সে খাবার গ্রহণ না করে থাকে। কেননা, সময়টা হলো ইফতারের সময়। এ সময় রোজা শরীয়ত সম্মত নয় (অবশ্য কিছু আলেম এ হাদীসটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন)।

عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا – بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار" متفق عليه .

২। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই আমি একজন মানুষ, তোমরা আমার নিকট বিতর্ক নিয়ে আসো, তোমাদের কিছু লোক একে অপরকে দলিল হিসেবে পেশ করো, আর আমি ফায়সালা করি যেমন আমি শুনেছি, সুতরাং আমি যাকে এমন ফয়সালা দিয়েছি যাতে তার (মুসলমান) ভাইয়ের হক্ রয়েছে, তাহলে যেন আমি তাকে জাহান্নামের একটা অংশের ফায়সালা দিলাম।" (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো, শরয়ী হুকুম (মিথ্যা) শরয়ী প্রমাণের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। এর মাধ্যমে শরীয়তের বিধানই সাব্যস্ত হবে যদিও বাস্তবে তা না ঘটে।

মূলনীতির সামঞ্জস্য বিধান:

নিয়োগকৃত ইমাম যখন একা নামায পড়েন, তাহলে যেন তিনি জামাআতের সাথে নামায পড়েছেন, কেননা তিনি যখন মসজিদে যাবেন, জামাআতের ইমামতির জন্যই যাবেন। তখন যদি মসজিদে কেউ উপস্থিত না-ও হয়, তবুও সেটা জামাআত বলে গণ্য হবে। আর তার জামাআতের সওয়াব লাভ হবে। তার মসজিদে আর দ্বিতীয়বার জামাআত হবে না। যেমন মালেকী মাযহাব মতে, ইমামের একার নামায শরীয়তের দৃষ্টিতে জামাআতের মর্যাদা পাবে। আর শরীয়তে যা উপস্থিত তা বাস্তবেও উপস্থিত বলে গণ্য হবে।

যখন কোনো নারীকে তালাক দেয়া হয়, তখন সে তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে যায়। অতঃপর যদি স্বামী তার তালাক দেয়াকে অস্বিকার করে, আর বিচারক সাক্ষী না থাকার কারণে তালাক না হবার ফায়সালা দেয়, তবুও সেই স্ত্রীকে তার জন্য বহাল রাখা ও তার সাথে মিলিত হওয়া হারাম হয়ে যাবে।

তাহলে খিলাফত ও তার হক্ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির হুকুম সাব্যস্ত হয় বায়আতের মাধ্যমে। আর খিলাফত তো পূর্বের থেকেই বিদ্যমান আছে, কারণ আগের থেকেই শরয়ী বায়আতের সাথে শরয়ী ইমাম নির্ধারিত হয়ে আছে। আর তিনি হলেন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা ওমর হাফিজাহুল্লাহ।

বিদ্যমান ‘খিলাফতের ঘোষণা’ টি প্রচলিত রাজনৈতিক ধারণার অনুসরণে হয়েছে, আর তা ফিকহী হুকুমের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না, কেননা খিলাফতের ব্যপারে ফিকহী হুকুম হলো বায়আত সংশ্লিষ্ট, এলান সংশ্লিষ্ট নয়। সুতরাং খিলাফতের সুপ্ত ঘোষণা বায়আতের মাধ্যমেই হয়ে গেছে যদিও বা এলান পাওয়া যায় নি।

উদাহরণস্বরপ বিয়ে, তা সংঘঠিত হয় ‘আক্দ’ এর মাধ্যমে, আর এটাই বিয়ের শর্ত, চাই এলান পাওয়া যাক, অথবা না পাওয়া যাক। (প্রচলিত নিয়মানুসারে) যদিও বিয়ের জন্য এলান দাবি রাখে।

অতঃপর এই ‘খিলাফতের এলান’ যদি পরবর্তী বায়আতের প্রতি হয়, তাহলে ফিকহী হুকুম তার (এলানের) পক্ষে হলেও তা (এই এলান) খেলাফতের বিরুদ্ধে যাবে.....

তা খিলাফতের পক্ষে হতো, যদি এই ‘খিলাফতের এলান’ টা প্রথম বায়আত প্রাপ্ত প্রথম আমীরের পক্ষ হতে হতো অথবা আমীরদের মধ্যে প্রথম বায়আত প্রাপ্ত কেউ হতো.........

আর তা খিলাফতের বিরুদ্ধে যাবে, যদি খিলাফতের এলানদাতা প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত আমীর না হয়, বরং ‘খিলাফতের এলান’ই বৈধ নয় যদি প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত না হয়, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"فوا ببيعة الأول فالأول"

“প্রথম বায়আতধারীর আনুগত্য করো তারপর প্রথম...” (মুসলিম)

বায়আতে বিজিত ব্যক্তির খিলাফতের এলান জায়েজ নয়, কেননা খিলাফতের পদ শূণ্য নয়। বর্তমানে এটি এমন একটি বিষয়, যেন বিবাহিত মেয়েকে বিয়ের ইচ্ছা করা।

ইসলামী খিলাফতের পতনের পর কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী একমাত্র সহীহ বায়আতপ্রাপ্ত শরয়ী আমীর হলেন মোল্লা ওমর হাফিজাহুল্লাহ। আর সহীহ বায়আত অর্থ হলো, পূর্বে অন্য কোনো আমীর বায়আতপ্রাপ্ত না হওয়া। খিলাফত তার জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে। যদিও তিনি খিলাফতের এলান না করে থাকেন। কেননা খিলাফত বায়আতের সাথে সম্পৃক্ত।

আর যে বায়আত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমরকে দেয়া হয়েছে, তা অবিরত কার্যকর থাকবে। কাফেরদের আফগানিস্থানের বিভিন্ন শহরসমূহ অধিকার করার কারণে তার খিলাফত বাধাগ্রস্থ হবে না। কেননা বায়আত বিদ্যমান থাকতে ভূমির কর্তৃত্ব খিলাফতের জন্য শর্ত নয়। কর্তৃত্ব হারানো খিলাফতের জন্য বাধা নয়।

উক্ত কারণে অন্যান্য যে ইমারতসমূহ তালেবানদের পর প্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে, শরয়ীভাবে তা ইমারতে ইসলামী আফগানিস্থান এর তাবে (অনুসারী), আর তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই কথার ভিত্তিতে,

"فوا ببيعة الأول فالأول"

“প্রথম বায়আতধারীর আনুগত্য করো তারপর প্রথম...” (মুসলিম)

সুতরাং যে ব্যক্তি এই খিলাফত ব্যতীত নিজেকে এ বিষয়ের (খিলাফতের) দাবি করলো, সে নিজে থেকে খিলাফত সংশ্লিষ্ট বিষয়কে অস্বীকার করলো।

হ্যাঁ... মুসলিমবিশ্ব ও সমস্ত আমীরগণ মিলে যদি আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এর সাথে পরামর্শ করেন, আর তিনি যদি উক্ত বিষয় মেনে নেন যে, খিলাফতের বিষয় তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে দিলে তার আপত্তি নাই, তবে তাতে কোনো সমস্যা নাই।

আর যদি তার পরামর্শ ব্যতীত খিলাফতের উপর আক্রমণ করে বসে, তবে তা হবে খিলাফতের সাথে বিদ্রোহ।

“প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একাধিক আমীর হওয়ার ব্যাপার শরীয়তে বিদ্যমান আছে” এ কথার দ্বারা পরবর্তী বায়আতপ্রাপ্তদের কারণে প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত আমীরের হক্ নষ্ট হবে না। যখন একাধিক আমীরের বৈধ প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, তখন ইমারতের দায়িত্ব প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত আমীরের নিকট ফিরে আসবে, তার অধিকার হরণ জায়েজ নয়।

আমরা যখন বলি, ‘আমীর সমূহের বায়আত’, যেমন ইরাক, লিবিয়া ও অন্যান্য ইসলামী দেশ সমূহ, এর অর্থ হলো সেখানের বায়আতটা হবে স্বতন্ত্র বায়আত, এ কথার ভিত্তি হলো, এক পতাকাতলে সকলের একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নয় বিধায় একাধিক আমীরকে শরীয়ত বৈধতা দিয়েছে। যখন ওজর খতম হয়ে যাবে এবং একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব হবে, তখন মূলের দিকে ফিরে আসা ফরযে আইন ‘একাধিক আমীর শরীয়তবদ্ধ না হওয়ার কারণে।’ আর যখন আমরা সেই মূলের দিকে ফিরবো, তখন মূলসংশ্লিষ্ট সূত্রের দিকে ফিরতে হবে, আর তা হলো “প্রথম বায়আতকে আঁকড়ে ধরা।”

এখন সম্ভাবনাময় দু’টি পথ আমাদের সামনে বিদ্যমান, যেমনটি আমি ইতিপূর্বে বলেছি,

১। হয়তো আমরা বলবো, সম্মিলিতভাবে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর না হওয়ার কারণে একাধিক আমীর শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে। সেক্ষেত্রে যার যার এলাকায় অধিষ্ঠিত আমীরের বায়আত ওয়াজিব হবে। সেক্ষেত্রে মূল আমীরের বায়আত না হওয়ার কারণে কোনো ব্যক্তিকে গোনাহগার বলা জায়েজ হবে না।

২। অথবা বলবো, একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব, তখন একাধিক আমীর বাতিল হয়ে যাবে। তখন ওয়াজিব হবে প্রথম আমীরের প্রতি বায়আত দেয়া, আর তিনি হলেন আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর হাফিজাহুল্লাহ।

অনেকে মোল্লাহ মোহাম্মদ ওমর হাফিজাহুল্লাহ এর উপর অভিযোগ করেন যে, তিনি কুরাইশী নন। কুরাইশী হবার মাছআলায় যা আলেমগণ বলেছেন, তাঁর ক্ষেত্রে তো তা পাওয়া যাচ্ছে না? তবে বলবো যে, এ শর্তটি (কুরাইশী) তালেবানদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়, কেননা ইমারতে ইসলামিয়্যাহ তাদের দ্বারাই গঠিত হয়েছে। তখন বহুসংখ্যক সমমনারা তাদের নিকট বায়আত দিয়েছেন ইমামতের শর্তানুযায়ী, তাই এর উপরই বায়আত কার্যকর হয়ে গেছে। আন্যান্য মুসলমানগণ তাদের ‘তাবে’ (অনুসারী) হয়ে গেছে।

যখন দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ খিলাফতের এলান করেছে, তখন তারা শরয়ী কিছু ভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে সেগুলো হলো,

১। খিলাফাত ঘোষণা করা হয়েছে আবু বকর আল বাগদাদীর নামে, অথচ সে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এর বায়আতের দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি। যদিও আবু বকর আল বাগদাদী মূলত শাইখ জাওয়াহিরীর হাতে বায়আতকৃত, তাই তার জন্য হালাল হবে না বিচ্ছিন্নভাবে

খিলাফতকে নিজের জন্য দাবি করা। আর যদি তার গর্দানে কারো বায়আত না থাকে, তবে সে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এর বায়আতের দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি, তাই তার খিলাফতের ব্যাপারে নিজের দিকে দাবি করা অনধিকার চর্চা বৈ আর কিছু নয়।

২। খিলাফতের মাকসাদ হলো কালিমাকে একত্র করা এবং মতপার্থক্য দূর করা। তাই এলানকালে এ মাকসাদের দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখা জরুরি ছিল। কিন্তু আবু বকর আল বাগদাদীকে (খলীফা হিসেবে) নির্বাচন মুজাহিদীনদের এক বিরাট বিতর্কের ময়দানে এনে দাঁড় করিয়েছে। একাকীভাবে একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়ে খিলাফত ঘোষণা করে ফেলেছেন। কার্যকর পরামর্শ যা করতে আল্লাহ (মুমিনদের) আদেশ করেছেন, তা করা হয় নাই। অথচ দ্বিতীয়পক্ষের সাথে পরামর্শের পথ সম্পূর্ণ খোলা ছিল। তাই বাস্তব চিত্র এভাবে ফুটে উঠেছে যেন তিনি এ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন যে, একটি জামাআতকে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা আর একটি জামাআতকে লাঞ্ছিত করা আর তাদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া। ....এতে তো মতবিরোধ বাড়বে .. গভীর থেকে গভীতর হবে।

দাওলাতুল ইসলমীর ভাইয়েরা পানি আরো ঘোলা করলো এভাবে যে, তারা তাড়াহুড়া করে তাদের একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে ফেললো, যদি তাদের নির্বাচনটা হতো তাদের জামাআতের বাইরের কোনো ব্যক্তির দ্বারা, তবে তা হতো বেশী সংগতিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়ক।

৩। এমনভাবে খিলাফতের এলানের মাধ্যমে দাওলাতুল ইসলামী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো, যেন অন্য কোনো মুসলিম দেশে শরয়ী ইমারত মওজুদই ছিল না। তালেবানদের সাথে না কোনো পরামর্শ আর না বিবৃতি দিলো। কেন? নাকি তাদেরকে শরয়ী ইমারত হিসেবে গণ্য করা হয় নাই?

আর যদি শরয়ী ইমারত হিসেবে গণ্যই করে, তবে কোন দলিলের ভিত্তিতে শরীয়তকে নাকচ করলো? আর তাদের অনুসারীদের বললো যে, আমার হাতে বায়আত করো?

আর যদি মাকসাদ এই হয়ে থাকে যে, প্রচলিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বকে একত্র করা, তবে কেন দাওলাহ এর সমাধানকল্পে এ ঘোষণা করলো না যে, এ এলান তালেবানদের পক্ষ হতে খেলাফত বিস্তৃতির নিমিত্বে?

কোন সে দলিলের ভিত্তিতে অন্যান্য ইসলামী ইমারতের উপস্থিতিতে “দাওলাতুল ইসলামী” এর অধিকার (তাদের) দেয়া হবে?

৪। দাওলাতুল ইসলামীর ভাইয়েরা তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে বড় একটি ভুল করলো, এভাবে পূর্ববর্তী বায়আতকে ভঙ্গ করলো আর মুজাহিদীনদেরকে তাদের নেতাদের অবাধ্য হতে উদ্বুদ্ধ

করলো। এর মাধ্যমে বিরাট এক ফিৎনা সংঘটিত হলো। যেহেতু কেউ তাদের অনুসরণ করেছে আর কেউ তাদের বিরোধিতা করেছে।

হে মুসলমানগণ!

নিশ্চয়ই বায়আত হলো দ্বীন, যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গোলামী করে থাকি এবং একটি অঙ্গিকার ও কঠিন প্রতিশ্রুতি.....

কিন্তু কিছু মুসলমান এ নিয়ে তামাশা করে থাকে, তাদের দেখবেন, এই জামাআতের বায়আত দিচ্ছে, তাতে যদি তাদের পছন্দ না হয় তবে তারা আরেক জায়গায় বায়আত দিবে, তাতেও যদি তারা সন্তুষ্ট না হয় তবে আরেকটা ধরবে। এভাবে তারা বায়আত আর ভঙ্গের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। এভাবে বায়আত তার মর্যাদাকে হারাচ্ছে, তা মানুষের মনে প্রতিবন্ধকতা অথবা নেতাদের বিরোধিতা অথবা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ব্যতীত কিছুই দিতে পারবে না...

তাই সাবধান! আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করুন এবং বায়আতের উপর অটল থাকুন, আর দ্বীন নিয়ে ক্রীড়া কৌতুক করবেন না।

অবশেষে বলবো,

এটা কোন রাজনৈতিক বিবৃতি নয়, এটা হলো শরয়ী হুকুমের আলোচনা। আর আমরা শরীয়তের বিচারে কারো পক্ষাবলম্বন করি না, বরং তাই বলবো যা আমরা ইলম ও বিশ্বাস অর্জন করেছি। যদি আমি সঠিক বলে থাকি, তবে সেটা আল্লাহ তাআলার তাওফীকে হয়েছে, আর যদি ভুল হয়ে থাকে তবে তা আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ থেকে মুক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আবু মুনযির আশ-শানকীতী

১৫-০৭-২০১৪